আসন্ন নির্বাচনে কেমন প্রার্থী চাই?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩ মার্চ, ২০০৮)

নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জাতির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সম্প্রতি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এ ব্যাপারে আবারো দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এ লক্ষ্যে কমিশন একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করে সামনে এগুচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোও নির্বাচনের, বিশেষত সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ক্রমাগতভাবে উচ্চকণ্ঠ। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আমাদেরও দাবি ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তবে নির্বাচন হলেই হবে না, নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রধান দলগুলোর অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক এবং সর্বোপরি অর্থবহ, যার মাধ্যমে আমাদের নেতৃত্বের গুণগতমানে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে এবং দেশে সুশাসন ও সত্যিকারার্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আসন্ন সকল নির্বাচনে আমরা কী ধরণের প্রার্থী চাই – তা নিয়ে এখন থেকেই ভাবা শুরু করতে হবে। বাস্তবায়ন করতে হবে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সংস্কার ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের, যাতে সমাজের ভাল মানুষেরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত হন, রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদেরকে অধিক হারে মনোনয়ন দেয় এবং তাঁদের নির্বাচিত হয়ে আসার পথ সুগম হয়। তাহলেই 'রাজনৈতিক ব্যবসায়ী'দের আবির্ভাবের ফলে আমাদের রাজনীতিতে চলমান 'বিরাজনীতিকরণ' প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে প্রতিহত করা যাবে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াত এবং সমাজের সকল স্তরের নাগরিকদের সাথে আলাপ-আলোচনার সুবাদে আমার ধারণা যে, অধিকাংশ নাগরিক আসন্ন নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী চায়। আর এই কাঙ্ক্ষিত যোগ্য প্রার্থী হবেন সজ্জন – সৎ, দক্ষ ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি। অন্যভাবে বলতে গেলে, অধিকাংশ নাগরিক সন্ত্রাসের গডফাদার, কালোবাজারি, কালোটাকার মালিক, দুর্নীতিবাজ, স্বার্থান্বেষী, প্রতারক, দখলদার, নারী নির্যাতনকারী, যুদ্ধাপরাধী, উগ্রবাদী, ধর্মান্ধ, দলবাজ ও ফায়দাবাজদেরকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায় না। সৎ, দক্ষ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন এবং জিতে আসুক, তারা তাই চায়।

কিন্তু এ কথা সত্য যে, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো অনেকক্ষেত্রেই যোগ্য প্রার্থী মনোনীত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আমরা নাগরিকরাও অনাকাঙ্ক্ষিত প্রার্থীদেরকে প্রত্যাখান করতে অপারগ হয়েছি। এ কারণেই আজ আমাদের অনেক নেতা-নেত্রী দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগে জেলে অন্তরীণ আছেন এবং আমাদের অতীতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেকের সম্পর্কে অনেক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সব কয়জন সিটি মেয়রের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং তাঁদের পাঁচ জন বর্তমানে জেলে আছেন। আমরা আশা করি যে, ন্যায়বিচারের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হবে, কারণ রাজনীতি হতে হবে দুর্বৃত্তদের পরিবর্তে সত্যিকারের রাজনীতিকদের চারণভূমি। একইসাথে ভবিষ্যতে যাতে দুর্বৃত্তরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে না পারে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? এ লক্ষ্যে কার কী করণীয়?

যোগ্য প্রার্থীদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ – কমিশন নির্বাচনে, বিশেষত সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের অযোগ্যতার মাপকাঠি আরো কঠোর করতে পারে। সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের বর্তমান অযোগ্যতার মানদণ্ড আমাদের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে এবং *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ১২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী আদালত কর্তৃক ঘোষিত অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি, দেউলিয়া, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক, নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে লাভজনক কোন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১২ ধারা অনুযায়ী, সরকারকে কোন মালামাল সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ; সরকারের জন্য কোন কাজ বা দায়িত্ব পালনে চুক্তিবদ্ধ; সরকারের সঙ্গে চুক্তি বা মালামাল সরবরাহের কারণে কোন প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফার অংশ পান এমন ব্যক্তি; ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালক হিসেবে ঋণখেলাপী; এবং দুর্নীতির কারণে সরকারি কিংবা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে বরখাস্তকৃত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বরখাস্ত, অপসারণ ও বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়াও ধারা ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫ ও ৮৬-এর অধীনে দুর্নীতিমূলক আচরণ বা কোরাপ্ট প্রাক্টিসেস্ এবং বেআইনী আচরণ বা ইললিগ্যাল প্রাক্টিসেস্-এর জন্য অনূন্য ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য হবেন। উপরন্তু *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে*'র ৬৬ ধারা অনুযায়ী কোন নির্বাচিত প্রতিনিধির আসন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক শূন্য ঘোষিত হলে এবং শূন্য হওয়ার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে তিনি সংসদ সদস্য হতে পারবেন না।

নির্বাচন কমিশন তার প্রস্তাবিত *গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ২০০৭*-এ আরো কয়েকটি নতুন অযোগ্যতার মাপকাঠি অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনাকালে আবারো সংশোধন করা হয় (*প্রস্তাবিত গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ২০০৮*)। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য হবেন যদি: বিদেশী অনুদানে পরিচালিত

সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কার্যনির্বাহি বা কর্মচারি পদে থাকা অবস্থায় অথবা পদ থেকে পদত্যাগ, অবসর কিংবা পদচ্যুত হওয়ার পর তাঁর তিন বছর অতিবাহিত না হয়; সরকারি চাকরি হতে পদত্যাগ, বরখাস্ত, অপসারিত, বাধ্যতামূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত কিংবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর তাঁর তিন বছর অতিবাহিত না হয়; ব্যক্তিগত বা নির্বাচিত প্রতিনিধি বা কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তিন মাসে আগে থেকে যে কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিলখেলাপী হিসেবে পরিচিত হন; গৃহ নির্মাণের জন্য কোনো ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ ব্যতীত, অন্য সকল ব্যক্তিগত ও ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর অংশিদার বা পরিচালক হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখের পূর্ববর্তী এক বছরের মধ্যে ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসেবে কিস্তি পরিশোধে তিনি খেলাপী হন; এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত/ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দণ্ডিত হন।

শাসনকার্যের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন থেকেও দুর্বৃত্তদেরকে দূরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে গত জুন মাসে গঠিত 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি' স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার মানদণ্ডকে আরো কঠোর করার প্রস্তাব করে। যেমন, কোন ব্যক্তি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য হবেন যদি তিনি: ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; সংশ্লিষ্ট পরিষদ/কর্পোরেশনের কাছে ঋণখেলাপী হন বা পরিষদের কাছে তার দায়-দেনা থাকে; তিনি কোন আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সমবায় সমিতি ইত্যাদি থেকে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচারণ ইত্যাদি অপরাধে চাকরিচ্যুত হয়ে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না করেন; সরকারি কোন পাওনা (যেমন – ভূমি উন্নয়ন কর, সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বকেয়া ইত্যাদি) যথাসময়ে পরিশোধ না করেন; নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা প্রাপ্ত হন; তিনি সংশ্লিষ্ট পরিষদ/কর্পোরেশনের তহবিল তসরুফের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন; বিগত দশ বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধি ১৮৯ ও ১৯২ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হন; বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধি ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত ও অপসারিত হন; কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসেবে ঘোষিত হন; দায়িত্ব হস্তান্তরে ব্যর্থতা বা নির্বাচনে অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিলের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হন; স্থানীয় সরকার পরিষদ বা কর্পোরেশন কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্পোরেশনকে পরিশোধ না করেন। এছাড়াও কমিটির সুপারিশ একইসাথে জাতীয় সংসদ ও একাধিক স্থানীয় সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার ওপর এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য ঘোষণার দাবি আজ গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দণ্ডিত হওয়ার মাধ্যমে কমিশনের প্রস্তাবিত বিধান এ মুহূর্তে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে কার্যকর হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেশি ভারতীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত একটি সংস্কার প্রস্তাব প্রণিধানযোগ্য। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে কমিশন ২০০৪ সালে তাদের ২২-দফা সংস্কার প্রস্তাবে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালত কর্তৃক চার্জশীটভুক্ত হলেই নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য ঘোষণার সুপারিশ করে। আইনভঙ্গকারীরা যাতে আইনপ্রণেতা না হতে পারে সে লক্ষ্যেই এ সুপারিশ করা হয়েছে। তাদের যুক্তি হলো যে: æThe Commission is of the view that keeping a person, who is accused of serious criminal charges and where the Court is *prima facie* satisfied about his involvement in the crime and consequently framed charges, out of electoral arena would be a reasonable restriction in greater public interests. There cannot be any grievance on this. However, as a precaution against motivated cases by the ruling party, it may be provided that only those cases which were filed prior to six months before an election alone would lead to disqualification as proposed. It is also suggested that persons found guilty by a Commission of Enquiry should ... stand disqualified from contesting elections." (www.eci.gov.in). জম্মু এবং কাশ্মীরের রিপ্রেজেনটেশন অফ পিপল এক্ট-এ এ ধরনের একটি বিধান রয়েছে। এছাড়াও গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে বিচারের আগেই কিংবা বিচারকালীন সময়ে কারাগারে অন্তরীণ করা গেলে, তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না কেন? এ ধরনের বিধান প্রস্তাবিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সংযোজন করে অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের মতো উপযুক্ত আদালত অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছে এমন চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদেরও নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে।

আমরা মনে করি যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের যোগ্যতার মানদণ্ড আরো কঠোর হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে ছোট ও চতুর দুর্বৃত্তরা, যারা হয় কারাদণ্ড এড়াতে পেরেছেন কিংবা দুই বছরের কম মেয়াদের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অর্থাৎ ছোট দুর্বত্তদের এখন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে কোন বাধা নেই। এমনকি বড় দুর্বৃত্তরাও কারাভোগের পাঁচ বছর পর নির্বাচন করতে পারেন। এছাড়াও আইনের ফাঁক-ফোকরে অনেক অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। ভোটারদেরকে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করার সুযোগ দিতে হলে যে কোন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত সকল দুর্বৃত্তদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। এজন্য অবশ্য আমাদের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন করতে হবে, যার জন্য অবশ্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তদুপরি স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত কোম্পানীর উদ্যোক্তা হিসেবে পরপর দুই বছর বার্ষিক সাধারণ সভা ও লভ্যাংশ যারা পরিশোধ না করেন তাদেরকেও আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার পক্ষে।

নির্বাচনে টাকার খেলাও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এ নির্বাচনী ব্যয়সীমা ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করা আছে। নির্বাচন কমিশন প্রাথমিকভাবে এ ব্যয়সীমা রাখার পক্ষে অবস্থান নিলেও, তাদের সর্বশেষ প্রস্তাবে এর সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ১৫ লাখে উন্নীত করার সুপারিশ করে, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নির্বাচনে টাকার খেলা নির্বাচনকে নিছক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পর্যায়ে নামিয়ে আনে এবং স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী এবং কালো টাকার মালিকদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত এবং যোগ্য প্রার্থীদেরকে নিরুৎসাহিত করে।

বিভিন্নভাবে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করা যায়। যেমন, প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকায় সকল প্রার্থীদের নিয়ে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণ একাধিক প্রজেকশন মিটিংয়ের আয়োজন করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও গত তিনটি উপনির্বাচনে 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র পক্ষ থেকে প্রার্থীদের জনগণের মুখোমুখি করে আমরা অতীতে উল্লেখযোগ্য সুফল পেয়েছি। একইসাথে প্রার্থীদের পক্ষে মিটিং, মিছিল, শোডাউনের ওপর কড়াকড়িভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে, যা কমিশন ইতোমধ্যে প্রস্তাব করেছে। এছাড়াও প্রার্থীদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি কমন পোস্টার কমিশনের পক্ষ থেকে ছাপিয়ে তাঁদের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করা যেতে পারে। এজন্য প্রার্থীদের থেকে মুদ্রণ খরচ নেয়া যেতে পারে। অন্য সব ধরনের প্রচারপত্র প্রকাশ ও বিলিকরণের ওপর কঠোর বিধিনিষেধও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নির্বাচনী ব্যয়সীমা হ্রাস করলেই হবে না, ব্যয়ের সঠিক হিসাব দেয়ার ব্যাপারে আইনি বাধ্যবাধকতাও নির্বাচন কমিশনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক নয়। যেমন, ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে সর্বমোট ১৯৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫৮৭ জন সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের বিবরণী (ফরম-১৭এ) এবং নির্বাচনী ব্যয়ের প্রকৃত বিবরণী (ফরম-১৭বি) দাখিল করেন। এক্ষেত্রে নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য প্রদান সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘনের জন্য ২ থেকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আইনের এ সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘনের জন্য কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কমিশন কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। আর যেসব প্রার্থী হিসাব দাখিল করেছেন তাঁরাও ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁদের নির্বাচনী ব্যয় ৫ লাখ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও তাঁদের প্রায় সকলেরই প্রকৃত ব্যয় নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে অতীতে দলমত নির্বিশেষে অধিকাংশ নির্বাচিত সংসদ সদস্যই মিথ্যাচার দিয়ে আইন প্রণেতা হিসেবে তাঁদের যাত্রা শুরু করেন। নির্বাচনে টাকার খেলা রোধের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কঠোর ও পদ্ধতিগতভাবে নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। উদাহরণসরূপ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশানের আমলে ১৯৯৩ সালে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন অন্ধ্র প্রদেশ, কর্নাটক ও সিকিমের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রার্থীদের দৈনন্দিন নির্বাচনী ব্যয় মনিটরিং-এর জন্য ৩৩৬ জন অডিটর নিয়োগ করে, যার ফলে নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের নির্বাচন কমিশন চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন থেকে এ কাজটি শুরু করতে পারে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও সঠিক তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেও নির্বাচন কমিশন যোগ্য প্রার্থীদেরকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে। সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশ হাইকোর্ট এ বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করে ২০০৫ সালে একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করে, যার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে দাখিল করা আপিল বহু কেলেঙ্কারীর পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সম্প্রতি খারিজ করে দেন। অসৎ, দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসের গডফাদার তথা দুর্বৃত্তদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে উচ্চ আদালতের এ রায়টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগতে পারে। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত ফরিদপুর-১ আসনের উপ-নির্বাচনে জোট সরকারের প্রার্থী কাজী সিরাজুল ইসলামের (যিনি এর আগে আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপি'তে যোগদান করেন) দাখিল করা হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগে দল কর্তৃক মনোনয়ন বাতিল এক্ষেত্রে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। আদালতের রায়কে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে দলে নির্বাচন কমিশনকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের বিধান করতে হবে এবং এগুলো সময়মতো বিতরণের মাধ্যমে ভোটারদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। একইসাথে প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদানকারীদের এবং তথ্য গোপনকারীদের প্রার্থিতা/নির্বাচন বাতিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন তার ঘোষিত সংস্কার প্রস্তাবে আদালতের রায়ের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্রের সাথে আটটি তথ্য সম্বলিত একটি 'ঘোষণা' প্রদানের সুপারিশ করে। কিন্তু আদালত হলফনামার আকারে তথ্যগুলো প্রদানের নির্দেশ দেন। তাই কমিশনের প্রস্তাব আদালতের নির্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এছাড়া মনোনয়নপত্রের সাথে তথ্যগুলো দিলে তা সময়মতো প্রার্থীদের কাছে পৌঁছানো যাবে না। তাই আমরা 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র পক্ষ থেকে জনস্বার্থে বহুদিন যাবৎ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে প্রার্থীরা যেন 'সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক' এমন একটি দরখাস্ত আদালতের নির্দেশিত তথ্যসম্বলিত একটি হলফনামাসহ কমিশনের কাছে জমা দেয়ার দাবি করে আসছি। কমিশনের পক্ষ থেকে এসকল তথ্য সাথে সাথে প্রকাশ করারও আমরা দাবি করে আসছি। এ দাবির উদ্দেশ্য প্রার্থীদের প্রি-কোয়ালিফাই করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমরা এ ব্যাপারে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সময়মতো প্রার্থীদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পেলে ভোটাররা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না, ফলে আদালতের ঐতিহাসিক রায়ের উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে তাদের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় আমূল সংস্কার জরুরি। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো কেন্দ্রিয়ভাবে মনোনয়ন নির্ধারণ করে থাকে। দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদেরকে নিয়ে গঠিত মনোনয়ন বোর্ডের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রদান করার কথা দলীয় গঠনতন্ত্রে লেখা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয়

প্রধানরাই এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অনেকক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয় লেন-দেনের ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ, অভিযোগ রয়েছে যে, ২২ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৫০টি সিটের মনোনয়ন বিক্রি হয় ন্যূনতম ৫০ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০ কোটি টাকায়। বিএনপি'র ক্ষেত্রে মনোনয়ন বাণিজ্য হয় অদৃশ্যে ও আরো কৌশলে (*প্রথম আলো* ১৪ জানুয়ারি, ২০০৭)।

দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে অতীতে অনেক সময়ই প্রার্থীর সততা ও দক্ষতা বিবেচনায় নেওয়া হয় নি। অনেকক্ষেত্রেই বিবেচ্য ছিল নির্বাচনে প্রার্থীর বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বির পেশীশক্তি মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা। তাই অতীতের নির্বাচনগুলো বহুলাংশে হয়ে পড়েছে সন্ত্রাসীর গডফাদার ও কালোটাকার মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার দলের প্রাথমিক সদস্যদের গোপন ব্যালটের ভিত্তিতে মনোনয়ন নির্ধারণের প্রস্তাব করে। কিন্তু কমিশনের সর্বশেষ প্রস্তাবে দলের প্রাথমিক সদস্যদের নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর প্যানেল তৈরির সুপারিশ করে, যা থেকে দলের পার্লামেন্টারী বোর্ড প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে। এর মাধ্যমে মনোনয়ন বাণিজ্য দূর হওয়ার পরিবর্তে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে, এ আশংকা করা বোধ হয় অমূলক হবে না।

রাজনৈতিক দলগুলোও প্রার্থীদের থেকে তাঁদের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে তা যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের পর মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে পারে। একইসাথে দল প্রাপ্ত তথ্য ও মনোনয়নের জন্য ব্যবহৃত সুস্পষ্ট মানদণ্ড প্রকাশ করতে পারে। তাহলেই মনোনয়ন বাণিজ্যের মতো গর্হিত কার্য রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, রাজনীতিতে এখন আর যোগ্য ব্যক্তিরা আসেন না। এ অভিযোগের পেছনে সত্যতা রয়েছে এবং এ সত্যতার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। এ দুঃখজনক পরিস্থিতির পেছনে মূল কারণ হলো যে, আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এখন ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটে – কারো কারো মতে, ক্রিমিনাল সিন্ডিকেটে – পরিণত হয়েছে। দলগুলো এখন সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের আখড়া হয়ে গিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষে রাজনীতিতে প্রবেশ করা এবং টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে তাঁদেরকে সন্ত্রাসী পালন করতে হবে, কালো টাকার মালিক হতে হবে কিংবা অন্যদের অপকর্মের দোসর হতে হবে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে রাজনৈতিক দলের আজ আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, যাতে এগুলো গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অনেকের আশংকা যে, রাজনৈতিক দলগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে এ সকল সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে আমাদের রাজনীতির গুণগত মানের পরিবর্তনের সকল আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হতে পারে।

পরিশেষে, আমাদের রাজনীতিতে আজ দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন চরমভাবে জেঁকে বসেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন এখন অত্যন্ত জরুরি। একইসাথে জরুরি, সরকারের চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের কার্যকারিতা। তবে এ অভিযান নিরপেক্ষ হতে হবে এবং এতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও দুর্বৃত্তদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ী, আবাসিক এলাকায় প্লটসহ সংসদ সদস্য হওয়ার নানা প্রলোভন দূর এবং সংসদ সদস্যদের কাজ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ আইনপ্রণয়নে নিবিষ্ট রাখতে হবে। এরপরও যে সকল দুর্বৃত্ত (যেমন, ঋণ খেলাপী) আইনের ফাঁক-ফোকরকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচিত হন, তাঁদের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা অবশ্য দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০০৮ সালের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় সকল পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হবে। তবে দুর্বৃত্তদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ভোটারদেরকে সময়মতো দিতে হবে, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এছাড়াও সজ্জনদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করতে হবে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কলুষমুক্ত করে সজ্জনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন ও সত্যিকারের গণতন্ত্র কায়েম করার লক্ষ্যে অতীতে আমরা অনেক আন্দোলন করেছি। কিন্তু কোনোবারই আন্দোলনের ফসল নাগরিকদের ঘরে ওঠে নি, বরং প্রতিবারই তা স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা হাইজ্যাক হয়েছে। এবারও আমাদের সামনে আরেকটি সুযোগের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে হলে কতগুলো সুদূরপ্রসারী সংস্কারের পক্ষে আজ ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে। আশা করি, আমাদের সচেতন নাগরিকরা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন।